[illegible]

[illegible]

নন্দিতা আচার্য চক্রবর্তী

সকালটা শুরু হল এই ভাবে। ডিং ডিং ডিং…। বেজেই চলেছে অ্যালার্ম। ঘরের ভেতর আধো অন্ধকার। হালকা আকাশি মশারি। সে ঘুমন্ত অবস্থাতেই কম্বলের ভেতর থেকে হাত বার করে অ্যালার্ম স্টপ করে। ঘুম চোখে তাকিয়ে দেখে, লম্বা সিল্কের পর্দার ফাঁক দিয়ে ভারি ম্রিয়মাণ একটা আলো ঢুকছে। হতক্লান্ত দুটো মশা তখনও মশারির চালে বসে হুল ফোটানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। -ধেৎ! সে আবার কম্বল দিয়ে মাথা ঢাকে। আর সমানে নিজেকে বলতে থাকে, আটটায় ওঠার জন্য কেউ অ্যালার্ম দেয়? এই মেয়েটা, বল্ বল্, কেউ অ্যালার্ম দেয়?

এরপরেও তার কম্বল এক চিলতে সরেনা। কিছুতেই উঠতে ইচ্ছে করে না। অথচ শান্তিতে শুতেও পারেনা। অপরাধ বোধ খামচাতে থাকে। -'মনে আছে কিছুদিন আগেও সাতটার সময় গিয়ে স্কুলের খাতায় সাইন করতিস?'

ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই সে রাগ করে।– যখন যেমন তখন তেমন ভাই। এখন আমি উঠতে পারছি না। বেশ করবো, ন'টা দশ'টা অব্দি ঘুমবো।

না, 'বেশ' করাটা আর তার হল না। এবার ডোর বেল। ঘুমের মায়া জাল ছিন্ন করে তারস্বরে বাজতে থাকে। শম্পা! দু'মিনিটের মধ্যে না খুললে, শম্পা উল্টো দিকে হাঁটা মারবে। নাহ, এ ঘটনা কিছুতেই ঘটতে দেওয়া যাবে না। মনে প্রচুর জোর এনে এক ঝটকায় কম্বলের বাইরে এসে চাদর জড়িয়ে হুড়মুড় করে সে দরজা খুলতে দৌড়ল।

এ কী, অ্যালার্ম কোথায়? এ তো তার এডিটর সায়নদার ফোন! সর্বনাশ, কপালে দুঃখ আছে। মোট তিনবার রিং করেছে। প্রতিবারই সে অ্যালার্ম ভেবে বন্ধ করে দিয়েছে। আদৌ সে কোন অ্যালার্ম দেয়ইনি। অ্যালার্ম সেট করতে ভুলেই গেছিল!

সে কাঁপা হাতে রিং ব্যাক করে। টানা পৌনে তিন মিনিট ধরে প্রবল দাবড়ানি এবং ওর পক্ষ থেকে প্রচুর কাকুতি মিনতির পর কোনক্রমে অবস্থা সামাল দেওয়া যায়। 'তাহলে কখন বেরচ্ছিস? অ্যাসাইনমেন্টটা কিন্তু তুই জোর করে নিয়েছিস।'

তা নিয়েছে। বাইরে গিয়ে কাজ করার মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এবং কাজটাও অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং। তবে এক্ষুনি বেরোতে

হবে, সেটা বোঝেনি।-"তুমি কিচ্ছু চিন্তা কোর না প্লিজ, আমি সব সামলে নেব। ব্যাগ গোছানই আছে। জাস্ট হাফ অ্যান আওয়ার।"

বাঁকুড়া তার এই প্রথম যাওয়া। আশেপাশের জায়গা গুলো সম্পর্কে নেটে আগে থেকেই একটু ঝালিয়ে নিয়েছিল। রোহন সম্পর্কেও দেখছিল। কোথায় কী কাজ করেছে, সে সব ছাড়া ব্যাক্তিগত তেমন কিছু তথ্য সেখানে নেই।

"হাই, আমি মহুল।"

নীল স্করপিওর সামনের সিটে বসা শ্যামলা ছেলেটা ঘাড় ঘুরিয়ে নড করলো। ঝাঁকড়া চুল, বড় চোখ, সিনেমার হিরোর মত চেহারা। রীতিমত সুপুরুষ! ভাবা যায়, সমাজের একদম নিচের তলা থেকে উঠে আসা এ ছেলেটি আজ বিখ্যাত ড্যান্সার!

"আমি কিন্তু আপনার একটা ডিটেইলড ইন্টারভিউ করবো। কলকাতা থেকে ছুটে এসেছি এই ইন্টারভিউটার জন্যই।"

হাসি মুখে ছেলেটি আবার ঘাড় ফেরায়। -"আপনি তো ফিল্মটার ওপরেও লিখছেন।"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আউটডোরে এসেছি...তবে পাখির চোখ আপনার ওপর। হাঃ হাঃ, এমনভাবে বললাম...প্লিজ, ডোন্ট মাইন্ড!"

"আয় অ্যাম অনারড ম্যাম!" সে মাথা ঝাঁকায়, অমায়িক হাসে।

যাদবপুর এইটবি থেকে গাড়িতে ওঠার পর গাড়ি কোথাও থামেনি। লাঞ্চ হয়নি। বাথরুম যাবারও দরকার। সামনে বর্ধমান আসছে। কিছু বলতে হল না, গাড়ি আপনিই ব্রেক দিল। দুড়দাড় করে সবাই গাড়ি থেকে নেমে পরে। সায়নদা ফোন করে, "সব ঠিক আছে তো রে?"

মহুল ভেবেছিল, কার না কার সঙ্গে গাড়ি শেয়ার করতে হবে। কিন্তু রোহন এবং সঙ্গে দুটো অতি লাজুক ছেলে ছাড়া এ গাড়িতে আর কেউই উঠলো না। তারা আবার চুপটি করে একদম পেছনের সিটে উঠে বসে আছে। মাঝের লম্বা সিটে মহুল একা। সায়নদা বলেছিল, ওরা যত্ন করে নিয়ে যাবে। তবে এত যত্নেও অস্বস্তি হয়। দু'একবার ডেকেওছে সে ওদের। তারা সেই লাজুক ভাবে মাথা নেড়ে জানিয়েছে, ওদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

বর্ধমানে পনেরো মিনিট লাঞ্চ ব্রেক। বলা যায়, লেট লাঞ্চ। এরপর রোহন এসে ওর পাশে মাঝের সিটে বসলো।– "শুনেছি ছোট বয়সেই আপনি মা-বাবাকে হারিয়েছেন। সেখান থেকে আপনার এই এতটা জার্নি... আই মিন, আপনার এই সাকসেস, এ তো পুরো গল্পের মত! আমরা কি এখন একটু আধটু কথা শুরু করতে পারি?"

"বেশ তো, এতটা রাস্তা, কথা বলতে বলতে যাওয়া যেতেই পারে। আমি প্রথম বড় সুযোগটা পাই ন্যাশনাল চ্যানেলের এক রিয়ালিটি শোয়ে। সত্যি সেই জার্নিটা ছিল স্বপ্নের মতই। খোলা আকাশের নিচে বড় হওয়া একটা ছেলে হঠাৎ করে হাজার হাজার ওয়াটের আলোর নিচে, এ তো রূপকথার গল্পই।"

মহুল রোহনের দিকে তাকিয়ে থাকে, ...কেমন একটা মায়া হয়। আর আবার সেই মনে হওয়াটা ফিরে আসে। কোথায় যেন সে দেখেছে ওকে! অর্ক শুনলেই বলতো, "দেখ গিয়ে তোমার হাজার হাজার ফেসবুক ফ্রেন্ডের মধ্যে ঢুকে বসা কোনও ফ্রেন্ড। পাগল একটা!"

কথাটা খুব মিথ্যেও না। এ রকম আগেও হয়েছে। তবে এ ছেলেটা তো কখনই ওর ফেসবুক ফ্রেন্ড নয়! বেশ অনেক সেলিব্রিটিই

তার ফেবু ফ্রেন্ড। এবং তাদের প্রত্যেককেই ওর বেশ ভাল মনে আছে। সত্যি কথা বলতে কী, ফেসবুক তো লাস্ট কয়েক বছরের ব্যাপার। তার আগেও কারুকে কারুকে দেখে ওর মনে হত, খুব যেন চেনা। কেউ কেউ আইডেন্টিফায়েডও হত। হ্যাঁ, এ তো সেই বাবা-মা'র সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে দেখা হয়েছিল অথবা কাকাইয়ের সঙ্গে সুমনের গান শুনতে গিয়ে কলামন্দিরে আলাপ হয়েছিল? কখনো আবার তার কারুকে মনে হত, বহুযুগ আগে দেখা, যেন পূর্বজন্মের চেনা-শোনা! সত্যি, কী ক্ষ্যাপা সে!

নাঃ, এ ছেলেটার ক্ষেত্র আরও একটু অন্য রকম। একে যেন এ জীবনেরই কোন এক সময়সারণীতে অনেকটা বেশি করে দেখেছে। কেমন নীল কুয়াশায় মাখা সেই স্মৃতি। ধুস, সিরিয়াসলি এবার তাকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেতে হবে। এরকম অদ্ভুত 'চেনা চেনা লাগা'র রোগটাকে বাগে আনতে হবে। নিজেরই হাসি পেয়ে যায় তার। সত্যি সে বড় পাগল!

অর্ককে একবার ফোন করা দরকার। বেচারা জানেও না, ও আউট অফ স্টেশন হয়েছে। আসলে ও-ও একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে জোর করে চলে এসেছে। অর্ক এখন সিঙ্গাপুরে, অফিসের কাজে। ফিরতে দিন সাতেক। কলকাতায় থাকলে ফট করে ওকে বাঁকুড়ার মত অজানা জায়গায়, অচেনা লোকজনের সঙ্গে কিছুতেই ছাড়ত না। তবে মহুলের ধারণা, বার কয়েক কায়দা করে বাইরের অ্যাসাইনমেন্ট গুলো ঠিকঠাক উতরে গেলে, অর্ক আর বাধা দেবে না।

বাঁকুড়ার সোনামুখী। পাশেই জঙ্গল। সন্ধ্যার মুখে গিয়ে পৌঁছল। হিহি করে দাঁত কাঁপানো ঠান্ডা। শুটিং তখন প্যাক আপ। আবার পরদিন ভোর সাড়ে ছটায় কলটাইম। রোহনের সঙ্গে টুকটাক অনেক কথাই হল। তবু মূল সুরটা ঠিক ধরা পড়লো না।

ছোট্ট শহরতলি। পৌরসভার অতিথি নিবাসে থাকার ব্যবস্থা। পরপর সব ঘর গুলোতেই শ্যুটিং পার্টির লোকজন। সামনের ড্রাইভওয়েতে ছাউনির তলায় রান্নার বিরাট ব্যাবস্থা। হাঁড়ি-কড়া এবং রাঁধুনি-জোগাড়ের ব্যস্ততা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, লোকজন নেহাত কম আসেনি। বাইরের কোন এন্টারটেইনমেন্ট এর ব্যাপার নেই। অতএব কাজ শেষে সবাই মিলে জমিয়ে আড্ডা। ঠান্ডাও পড়েছে জব্বর। একটু রেস্ট নিয়ে মহুল নেবে এল নিচে।

উনুনের গনগনে আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রোহন। হয়তো ওপরের ব্যালকনি থেকে ওকে দেখে, আরও বেশি করে নিচে নেমে আসার ইচ্ছে হল মহুলের। কাল শুটিং শুরু হলে ব্যস্ততা বেড়ে যাবে। যতটা পারা যায় রোহণনের সঙ্গে আজই কথা বলে আউট লাইনটা তৈরি করে ফেলতে হবে। ভাল করে স্টোরিটা নামাতে পারলে, একটা কাজের কাজ হবে।

"কফি খাবেন?" রোহন হাতের কফিকাপ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

"দারুণ... সত্যি বলতে কী, ঠান্ডায় এই কফির কথাটাই ভাবছিলাম।" জোগাড়ে ছেলেটা এক কাপ গরম কফি এনে হাতে ধরিয়ে দেয়। উনুনের পাশে দাঁড়িয়েই কফি খেতে খেতে সে বুঁদ হয়ে শোনে রোহনের জীবন কথা। সাকসেস নয়, স্ট্রাগলের কথা। সাকসেস তো সে নেটেই পেয়ে গেছে। এটাই হচ্ছে আউটডোরে আসা এবং এতক্ষণ ধরে কথা বলার অ্যাডভান্টেজ। আবেগগুলো শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসেই!

– "এক সময়ে খালি গায়ে দিন কেটেছে। এরকম শীতেও। নদীর পাশে ইটখোলার মধ্যে বেড়ে ওঠা। কিছু বোঝবার আগেই মা মারা গেল। সম্ভবত অন্যরকম মৃত্যু ছিল। থানা পুলিশের ঝামেলার ভয়ে ইট খোলার মালিক একপ্রকার নামকাওয়াস্তেই আমার দায়িত্ব নিল। বাবা তো আগেই অন্য এক কামিনের সাথে কেটে পড়েছিল।"

সাংবাদিকতার প্রথম শর্তই আবেগ দমন। সব জেনেও মহুলের বুকের ভেতর ব্যথা করে। তার থেকে সামান্য বড় এই সুপুরুষ ছেলেটির দিকে সে মমতামাখা চোখে তাকিয়ে থাকে। ছেলেটার বড় বড় চোখ জুড়ে থাকা কুচকুচে কালো আইবলগুলোতে উনুনের দাউদাউ আগুনের কমলা ছায়া।

“বুঝতে পারছি!... আচ্ছা নাচ, মানে এই স্পেসটায় এলেন কেমন ভাবে? আপনার সেই বেড়ে ওঠার নদীর ধার, ইটখোলা...তা কোথায় ছিল, জানতে পারলাম না। যদি একটু...”

আচমকা রূঢ় হয়ে ওঠে রোহণ। –“কলাতলি,আমতলি, জামতলি...গঙ্গার পাশে কোন একটা জায়গা; সেটা কি খুব ইম্পরট্যান্ট? নদী, ইটভাটা এবং সব জায়গা থেকে লাথি খাওয়া একটা শিশুর জীবনযাপন...সবটাই তো বলা হল। এটাই তো যথেষ্ট স্টোরি!” - “আয় আম এক্সট্রিমলি সরি রোহন!” প্রচণ্ড থতমত খেয়ে যায় মহুল। অকারণেই সে তার লম্বা বিনুনি আঙুলে পেঁচাতে থাকে। রোহন আবার যেন কী বলছে...কিন্তু মহুল ক্ষণেকের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। মনের ভেতর প্রবল ভাবে ঘুরপাক খায়- জামতলি! -“আরে আমার তো বাড়ি...” ব্যাক্তিগত কথা বলার জায়গা নয় সাংবাদিকতা। সে থেমে যায়। তাছাড়া রোহনের দু’একটা কথা সে স্কিপ করে গেছে। কী বলছে এখন? অহ, ও-ও সরি বলছে!

–“নেভার মাইন্ড রোহন!” মহুল গালে টোল ফেলে অপূর্ব একটা হাসি দেয়। রোহনও লাজুক হাসে। হঠাৎ করে মুড সুইং করার জন্য ছেলেটা সত্যি খুব লজ্জিত হয়েছে। “তাহলে সেই থানা থেকে ডক্টর এডওয়ার্ডের এনজিও। ওখান থেকেই আপনার ডান্স স্কুলে আসা? মানুষটি এবং তাঁর এনজিও – দুটোই খুব লিবারাল অ্যান্ড ডিভোটেড ছিল বলছেন।”

“ইয়েস, আবসলিউটলি! উনি আমার কাছে ভগবান! তবে ওনার কাছে যাই আমি এক অ্যাঞ্জেলের হাত ধরে।”

“রিয়েলি! সেটা শুনতে পারি কি?” কথাটা বলেই আড়চোখে একবার মেপে নেয় মহুল। ছেলেটা আবার রেগে যাবে না তো? নাহ, রোহনের মুখে এক অদ্ভুত শান্ত সম্মোহনের ছায়া।

–“শেষ কীর্তি ছিল চুরি। এভাবেই থানা-পুলিশের মুখোমুখি। তখন পেট-পিঠ লেগে যাওয়া, ঠিকমত খেতে না পাওয়া আট’ন বছরের রোগা টিংটিং ছেলে। এক চোর ডাকাতের দলের খপ্পরে পড়লাম। এরকমই শীতের শেষ রাত। তারা ঢুকিয়ে দিল সে অঞ্চলের সব চেয়ে রহিস আদমির বাড়ি। এক তলার বাথরুমের জানলা দিয়ে কোনওক্রমে শরীরটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে ঢুকে পড়েছিলাম। সদর দরজা খুলে দেওয়া অব্দি আমার কাজ ছিল।”

“তারপর?” মহুলের চোখ বিস্ফারিত।

“ধরা পড়ে গেলাম! আমি এবং আরও তিনজন। লোকজন এসে বিরাট মারধর। ছোট বলে সামান্য রেয়াত করা হয়েছিল আমায়। তবু নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। সম্মিলিত মারধোর তো। গায়ের জামা ছিঁড়ে ফর্দাফাই। পুলিশ এল। শীতে কুঁকড়ে বসে আছি আমি। ভোর হয়ে গেছে। বাবার স্কুটারে চেপে স্কুল যাচ্ছিল সে। আমার অবস্থা দেখে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। নিমেষে নিজের স্কুল ইউনিফর্মের সোয়েটার খুলে আমার হাতে দেয়। ঠান্ডা হাওয়া এবং কান্নার দমকে ছোট্ট শরীরটা তার থিরথির করে কাঁপছিল। আজ বুঝতে পারি, সমবেত জনগণ এবং পুলিশকে সেদিন ও কতটা অপ্রস্তুত করেছিল। বাচ্চাদের তো স্ট্যাটাস বোধ থাকেনা। গঙ্গার ধারে আরও কয়েকজন বাচ্চার সঙ্গে আমিও ছিলাম তার খেলার সঙ্গী। ততক্ষণে ব্যাগ থেকে লাল রঙের টিফিন কৌটো বার করে আমার হাতে গুঁজে দিয়েছে। আমার জীবনে পাওয়া শ্রেষ্ঠ উপহার, শ্রেষ্ঠ আদর!”

নীল কুয়াশার ভেতর দিয়ে আচমকা আগুনের মত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এক চলমান ছবি! তুমুল ভাবে কেঁপে ওঠে মহুল! তার ঠোঁট কাঁপে, কিন্তু একটা শব্দও বার হয় না। শুধু তাকে ঘিরেই শুরু হয়ে যাওয়া এক প্রবল ভূমিকম্পের মধ্যে সে হাবুডুবু খায়! অনেক চেষ্টাতেও বাগ না মানা নোনা জলের প্রবাহ, সমস্ত এটিকেট ভাসিয়ে নিয়ে যায়! ঠিক তখনই, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঝকঝকে ছেলেমেয়ে দুটোর পাশে এসে দাঁড়ায় জোগাড়ে ছেলেটা। -‘স্যার, আপনাদের আর একবার কফি দেব?’ উনুনের লালচে আগুনের ছায়া কাঁপছে ছেলে-মেয়ে দুটোর ঋজু শরীরে। ওদের শূন্য কাপে, সে নিজে থেকেই ধোঁয়া ওঠা গরম কফি ঢেলে দেয়।